# ফ্রাঙ্কফুর্ট বই মেলা

- ওয়াসিম সাঈদ (দীপু)

আমার জীবনের একটি দূঃখজনক (ভাবান্তরে লজ্জাজনক) ব্যাপার হচ্ছে- আমার মাঝে বই পড়বার অভ্যেস তৈরী হয়েছে ঢের দেরীতে। যে অভ্যেস গড়া উচিৎ ছিল অন্তত আরো কুড়ি বছর আগে, তা গড়েছি মাত্র সাত বছর হলো। তাই আমার জ্ঞানের পরিধি মোটেও স্ফীত নয়। আমার যাঁরা পড়ুয়া বন্ধু আছে তাঁদের কাছে পূর্ণেন্দু পত্রী-র কথপোকথন বলতে গেলে অনেক পুরনো; কিন্তু আমি কথপোকথন পড়েছি এই তো সেদিন- মাত্র পাঁচ বছর আগে। ধর্মান্তরিত ব্যক্তি বিশেষই নুতন ধর্মের প্রতি অতি আকৃষ্ট হয়। না পড়ার 'অভ্যেস' পড়বার 'ধর্ম' গ্রহন করবার পর থেকে আমারো সেই অবস্থা। কোনো বই-এ যদি অজানা কোনো তথ্য পাই, তবে সে অজানাকে জানতে "মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি, চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা ছাড়ি, ভূল্যোক-দূল্যোক-গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া" - আরো দূর কোনো অজানালোকে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। কথপোকথনের চতুর্থ সংখ্যায় ইয়োরোপ ফেরত নন্দিনি যখন শুভঙ্করকে তার প্রবাসী জীবনের ব্যাথা ভরা গান গেয়ে শোনাচ্ছে সেখানে একটি পর্যায়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর বই মেলা-র উল্লেখ আছে। ব্যাপারটি আমার স্বল্প জ্ঞানের ক্ষীন ভান্ডারের দেয়ালে প্রবল আঘাত করে। অজানাকে জানতে এক্ষেত্রে ততটা বেগ পেতে হয়নি। ইন্টারনেটে গুগল-এ অনুসন্ধান করে পেয়ে যাই সমস্ত তথ্য।

জীবিকার তাগিদে ভাগ্যাণ্বেষনে গত সাত বছর যাবত আমি ফিনল্যান্ড-এ থাকি। এখান থেকে জার্মানের ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে যাওয়া প্রায় ততটাই সহজ যতটা ঢাকা থেকে নড়াইল যাওয়া। উল্লেখ্য ঢাকায় আমার জন্ম হলেও নড়াইল-এ আমার বাপ-দাদার ভিটে, তবু ইহজন্মে আমি সময়-সুযোগের

অভাবে নড়াইল যেতে পারিনি। বলা বাহুল্য গত পাঁচ বছর হাজারো পরিকল্পনা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কফুর্ট বই মেলা-য় যেতে পারিনি। আমার মাঝে প্রায় সর্ববিষয়ে উদ্দমের মাত্রার শতকরা হার যদি হয় ১০০, সেক্ষেত্রে উদ্দোগের হার শতকরা মাত্র ২। সেই ২-এর সঙ্গে এবছর আরো ৯৮ যোগ হলো যার ঠেলাঠেলিতে সে ছেলেটির নাম অণু। ছেলেটির মাঝে কোনকিছুতেই উদ্দোগের কমতি নেই, যার প্রমান সে রেখেছে প্রথম বাঙ্গালী হিসেবে উত্তর গোলার্ধে, Mt Blanc-এর চুড়ায় লাল-সবুজের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে। অণুর উদ্দোগেই এই বইমেলা যাত্রা। যাত্রার ছ'মাস আগেই সে এয়ার টিকিট, হোটেল রিজার্ভেশন সংক্রান্ত সকল কর্ম সুনিপুন হস্তে সম্পাদন করে রেখেছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট বই মেলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যা ইন্টারনেট ঘেটে আগেই জেনেছি তা এখানে উল্লেখ করলে কৃত্রিমতার ছড়াছড়ি হয়ে যাবে। যা কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাই লিখে দিচ্ছি অনভিজ্ঞ লেখনী শক্তির আচড়ে।

পোয়ার উপর সোয়া বারো- এবার আবার ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার ৬০ বছর পূর্তি। ইচ্ছে ছিল পাঁচদিন ব্যাপী আয়োজিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক এ বইমেলায় উদ্বোধনী ক্ষন থেকে সমাপনী লগ্নাবধি অবস্থান করবো। তা হলো কৈ? সময়াভাব, সময়াভাব আর সময়াভাব- এই সময়াভাব সত্যিই নিদারুণ এক অভাব। সে ব্যাখ্যা থাক। অযথা অপ্রাসঙ্গিকতায় গিয়ে পাঠকের সময় নষ্ট করতে চাই না। কেননা পাঠকের সময়াভাব থাকাটাও একেবারেই অসম্ভব নয়। ১৫ অক্টোবর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও আমরা রওনা দিই ১৮ অক্টোবর ভোরে। Lufthansa-এর বিমান আমাদের ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে উড়িয়ে এনে পৌঁছে দিল ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে। ইয়োরোপীয় উড়োজাহাজ গুলোর খাবারের বাক্স আমি ইহজনমে অর্ধেকটাও খেয়ে শেষ করতে পারিনি। তেলহীন, মসলাহীন, হাসপাতালের খাবারের মতন সে খাদ্য আমার গলা দিয়ে নামে না; তা পেটে হাজারো ছুঁচো একত্রে কেত্তন করুক না কেন। আমি নিরেট ভেতো বাঙ্গালী। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে নেমে পেটে কেত্তনরত ছুঁচোর সংখ্যা বুঝি হাজার ছাড়িয়ে লাখ ছুঁই ছুঁই। বিমানবন্দরের ভূতল থেকে ট্রেন চলাচলের সুব্যবস্থা আছে। যদিও বিমানবন্দর থেকে বইমেলা যাবার সরাসরি বাস ও ট্রেন

সার্ভিস বিদ্যমান, তবু ট্রেনে করে আগে সিটি সেন্টারে চলে এলাম। বাক্স-প্যাঁটরা কাঁধে করেতো আর মেলা উপভোগ করা সম্ভব নয়! আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলটি সিটি সেন্টার ও বইমেলার কাছাকাছি। সঙ্গে হোটেলের ঠিকানা আর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের ম্যাপ, তবু যেন গোলক ধাধায় পড়লাম। ভোজনও হবে আর হোটেলে যাবার পথনির্দেশনাও পাওয়া যাবে- এই আশায় এক ঢিলে দুই পাখি খতম করবার উদ্দেশ্যে ঢুকে পড়লাম এক তুর্কী রেস্তোরায়। ভোজন যদিও হলো কোনরকম, তবে তথ্য পেলাম না কিছুই। অল্পবয়েসী তুর্কী ছেলেটির কথা শুনে মনে হলো আজই সে প্রথম ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে পা রেখেছে। তার কাবাবের দোকান ছাড়া অন্য কোনো কিছু চিনতে সে মোটেও বাধ্য নয়। ঠান্ডা মাথায় ম্যাপ দেখে নিজেরাই হোটেল খুঁজে বের করলাম। কোনমতে কাঁধ-হাত মুক্ত করে ছুটে গেলাম গন্তব্যে। মক্কা শহরে পৌঁছে পূণ্যার্থীগণ যেমন কাবা দর্শণে অস্থির হয়ে উঠেন, আমাদের মাঝেও বইমেলায় পৌঁছুনোর তেমনি ব্যাকুলতা। বিমানবন্দর থেকে হোটেল আর হোটেল থেকে বইমেলা পৌঁছুতে প্রায় দুই ঘন্টা লেগে গেল। আসবার কালে পথে কোনকিছুই ঠিকমত নজরে পড়েনি। আমি যখন পূণ্যার্থে মক্কা গিয়েছিলাম কাবা দর্শণের আগ মুহুর্তাবধি কিছুই চোখে দেখিনি; যখন মথুরা গেলাম রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি দর্শণকালেই দৃষ্টিশক্তি অনুভব করলাম; দীল্লি থেকে আগ্রা যাবার সময় মনে হয়েছে পথের দুপাশে শ্বসান-শূন্যতা, নিষ্প্রান সে যাত্রা প্রান পেল তখনই যখন তাজমহল আমার নয়নসমুখে; যেবার লুভ মিউজিয়ামে গেলাম পিরামিড সদৃশ প্রবেশদ্বারে ঠেলাঠেলি ভীড়, সেখান থেকে Salle des États (যে গ্যালারীতে মোনালিসা রাখা আছে) পৌঁছুতে অসংখ্য বিখ্যাত বিখ্যাত ছবি আর ভাস্কর্য, তবু মোনালিসার 30" by 21" ফ্রেমের পাদপ্রান্তে এসেই দৃষ্টি স্বার্থক হয়েছিল। তেমনি এক অনুভূতি অনুভব করছি ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় পৌঁছে। যে বই পড়ে ও ভালবাসে তার কাছে এমনি বিশাল বই-এর আড়ং তীর্থ নয়তো কি! বহু বহু বছর আগে বিখ্যাত এক বাঙ্গালী যুবক নগ্নপায়ে বরফাচ্ছাদিত পর্বত আরোহন করেছিলেন অলৌকিক এক শিবলিঙ্গ দর্শণার্থে। আরোহনকালে তীব্র শীত আর ঢালু পিচ্ছিল পথ তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি, তিনি ছিলেন দারুণ এক ঘোরের মধ্যে। গন্তব্যে পৌঁছে বরফের শিবলিঙ্গ দর্শণে তাঁর

সমস্ত শরীরে সহস্র শিহরণ খেলা করে উঠে। আমি যখন ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় এসে পৌঁছাই আমারো অবস্থা তেমনি, যেমনি অমরনাথ দর্শণান্তে স্বামী বিবেকানন্দের।

বই-এর মেলা এত বড় ও ব্যাপক হতে পারে তা প্রত্যক্ষ না করলে অনুমান করা অসম্ভব। যে Exhibition Centre-এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে তার নাম Messe Frankfurt, এতে মোট ১০টি হল-ঘর; কোনটি দ্বিতল কোনটি আবার ত্রিতল বিশিষ্ট। যদিও আমাদের দেশের খোলা মাঠের মেলার মত অকৃত্রিম নয়, যদিও চারদিকে অত্যাধুনিকতার বিপুল ছড়াছড়ি তথাপি প্রানের অভাব নেই। এ যে বই-এর মেলা, প্রান থাকবে না? কথিত আছে যতটুকু এলাকা জুড়ে এই মেলা আয়োজিত হয় তাতে প্রায় ২৫টি ফুটবল মাঠ (অবশ্যই গ্যালারী ব্যাতীত; পাঠকের অনুমানের সুবিধার্থে জানাচ্ছি- বঙ্গবন্ধু ষ্টেডিয়াম-এর মাঠটি ২টি ফুটবল মাঠের সমান) স্থাপন করা সম্ভব। মূলদ্বার দিয়ে ঢুকে ঝটপট দুজনে একত্রে দুদিনের টিকিট কেটে ফেললাম। জনসাধারণের জন্যে প্রবেশমূল্য দিনপ্রতি ১২ ইয়োরো; এই টিকিটেই মেলার আভ্যন্তরীন ট্রান্সপর্টেশন-এর সুবিধে পাওয়া যায়। এক হল-এর দরজা থেকে দূরের অন্য কোনো হলে যেতে অনেকে নির্ধারিত মিনিবাস-এর সরনাপন্ন হন। তবেই বুঝুন ২৫টি ফুটবল মাঠের তথ্য নেহাতই অতিরঞ্জিত নয়।

মোট ১০০ টি দেশের ৭৩৭৩ টি সংস্থা এবার অংশগ্রহণ করেছে। বই, ক্যালেন্ডার, পোষ্টকার্ড, পোষ্টার, ইত্যাদিসহ মোট পন্যের সংখ্যা ৪০২২৮২, যার মাঝে ১২৩৪৯৬ টি সদ্য প্রকাশিত। পন্যের মাঝে বই-এর সংখ্যাই ৯৯%। প্রতিবছর অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্য থেকে একটি দেশকে Guest of honour -এর সম্মাননা জানানো হয়। এ বছর তুরস্ক সে সম্মানে সম্মানিত। মেলায় আয়োজিত ২৫০০ টি ইভেন্টের ৪০০ টি আয়োজন করে তুর্কী থেকে আগত মোট ২৫০জন লেখক এবং ১০০টি প্রকাশনী সংস্থা। টিকিট কাউন্টার থেকে কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম বড় একটি বোর্ডে নির্দেশনা দেয়া আছে- কোন হল কোন দিকে আর কোন হলে কোন কোন দেশ-এর

প্রকাশনীর স্টল বসেছে। বোর্ডে ৬.০ নম্বর হলে যে দেশগুলোর উল্লেখ আছে তাতে বর্ণক্রমানুসারে বাংলাদেশের নামটিই প্রথমে। সকলকিছু তুচছ জ্ঞান করে দিলাম ছুট। সেখানে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়লো চীনের বিশাল আর সুসজ্জিত কয়েকটি স্টল, আরেকদিকে জাপান-কোরিয়া, অন্য একদিকে ফিনল্যান্ড-সুইডেন-ডেনমার্ক; দিশেহারা হয়ে উঠলাম- আমার বাংলাদেশ কোথায়? একটু এগিয়ে দেখি পাকিস্তান আর ভারতের কয়েকটি সাইনবোর্ড। তবু আমার প্রানাধিকা মাতৃভূমিকে খুঁজে পাচ্ছি না। অণু-র গায়ে পরা লাল-সবুজের টি-শার্ট; বুঝিবা তাই দেখে শান্তকান্তির এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন- "আপনারা বাঙ্গালী? আসুন আমার সঙ্গে।" লোকটির নাম রবিন আহসান- শ্রাবণ প্রকাশনীর কর্ণধার। শ্রাবণ প্রকাশনীর স্টলে গিয়ে দুফোঁটা চোখের জল বড্ড কষ্টে গোপন করলাম। আশপাশের স্টল গুলোর তুলনায় সবচাইতে মলিন হলেও, অগোছালো ভাবে থাকে থাকে সাজানো বাংলা বইগুলোর মলাট ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে আসছে আমার সোনার বাংলাদেশ। কত যে ভাল লাগলো, কেমন করে বুঝাই! রবিন ভাই হয়তো আমার সমবয়েসী। আলাপে আলাপে অনেক তথ্য পেলাম। গত বছর তিনি ও তার প্রকাশনী ছিল আমন্ত্রিত, তবে এ বছর নিজ খরচায় আসতে হয়েছে তাকে; সঙ্গে এনেছেন তার গত বছরের অভিজ্ঞতা সম্বলিত বই- "বইবিশ্বে ১০ দিন"। ঝটিত কিনে ফেললাম বইটি। খুব আফসোস হলো, যখন জানলাম গতকালই (১৭ অক্টোবর) শ্রাবণ প্রকাশনীর স্টল ঘুরে গেছেন আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ, কবি আসাদ চৌধুরী, জার্মান প্রবাসী দাউদ হায়দার আর নাজমুন নেসা পিয়ারী। এ স্টলে আরো এসেছিলেন নোবেল বিজয়ী লেখক গুন্টার গ্রাস। গর্বের সঙ্গে পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি- ফিনল্যান্ড-এ বাংলা ভাষার একমাত্র পত্রিকাটি (মাসিক) এই অধমের (আমি) সম্পাদনায় এবং অণুর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়, নাম- "জননী বঙ্গভূমি"। আরেকটু গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি- আমাদের অনুরোধে এবং রবিনের বদান্যতায় "জননী বঙ্গভূমি"-র দুটি সংখ্যা শ্রাবণ প্রকাশনীর স্টলে স্থান পায়। এতবড় বইমেলায় "জননী বঙ্গভূমি"-র স্থান পাওয়া সত্যিই পুলক জাগানিয়া। পাশেই ভারত থেকে আগত কয়েকটি স্টল।

স্বভাবতই প্রথমেই চোখে পড়লো আনন্দ প্রকাশনীর নামটির উপর। ভারত সরকার অংশগ্রহনকারী তাদের প্রতিটি প্রকাশনীকেই অনুদান দিয়েছে, পাকিস্তান থেকে আগত প্রকাশনীটিও সরকারী অনুদানে পুষ্ট, একমাত্র বেচারা রবিন-কেই আসতে হয়েছে গাঁটের টাকা খরচ করে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম- আমাদের সরকার কিংবা পুস্তক বিষয়ক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবগত নন। ও ঈশ্বর, ধরণী দ্বিধা হোক। আমি মনে প্রানে প্রার্থণা করি প্রাপ্ত এই তথ্য যেন মিথ্যে প্রমানিত হয়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা যতটা না সাধারণ পাঠকের জন্যে, তার চাইতে কিছুটা বেশী পুস্তক বনিকদের জন্যে। বিশ্বের বড় বড় পুস্তক-ব্যবসায়ীরা মেলায় এসে তাদের বিজনেস ডিলিংস পাকাপোক্ত করেন। সুবিধে এই- একসঙ্গে হাজারো প্রকাশনী, হাজারো পন্য, হাজারো option. প্রকাশনীগুলো আসে তাদের নুতন ও সাম্প্রতিক প্রকাশিত পন্যাদি নিয়ে। মেলার প্রথম তিনদিন শুধু ব্যবসায়িকদের জন্যে বরাদ্দ। ভাগ্যিস উদ্বোধনী দিনেই আসিনি; নইলে নিয়মের গেড়াকলে পড়ে দুইদিন মেলার বাইরে ফুটপাথে বসে থাকতে হতো। আহারে অন্তত আর একটা দিন আগে আসতাম। এইতো গতকালই ঘুরে গেছেন সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী পামুক। বেশ কয়কটি স্টলে জিজ্ঞেস করে যখন জানলাম- এই মেলায় বই খুচরা বিক্রির জন্যে নয় তখন আমাদের মাথায় মহাকাশ ভেঙ্গে পড়লো। হায় আল্লাহ, পুস্তকে সমন্বিত এমন পূণ্যস্থান থেকে বই কিনতে পরবো না! কয়েকটি স্টল অবশ্য আশা দিল পরদিন খোঁজ নেবার জন্যে। সমাপনী দিনে কোনো কোনো প্রাকাশনী কিছু কিছু বই বিক্রি করে দেয়। তবে এই বইমেলার শতকরা ৯৯ ভাগ বই মেলা শেষে চলে যায় বিভিন্ন চ্যারিটিতে। অণুর ফোন পেয়ে তার এক জার্মান ও এক কুর্দী বন্ধু এসে যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। দুজনেই পাশের শহর ক্লন-এ থাকে। মেলার অভ্যন্তরে খাবারের ব্যবস্থা অনেক, তবে তা অখাদ্য। লম্বা লাইন ধরে আধ ঘন্টা অপেক্ষার পর একটি ঠান্ডা বীফ সসেজ, সঙ্গে খটখটে শুকনো শক্ত একটি বন-রুটি আমার ভাগ্যে জুটলো। রুটিতো নয়, যেন লৌহ গোলক। ভাগ্যিস সঙ্গে পানি ছিল, নইলে এ খাদ্য গলধঃকরণ হতো কি করে?

বই বিকিকিনির সুব্যবস্থা না থাকুক, এই মেলা সমস্ত পৃথিবীর পুস্তক প্রেমিক-প্রেমিকাদের একটি সুবিশাল মিলনস্থান। ত্রিবেনী সঙ্গমে মিলিত হয়েছে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী- তিনটি নদীর তিনটি ধারা। সেই সঙ্গমস্থলে মিশ্রিত আছে সমুদ্র-মন্থিত কয়েক ফোঁটা অমৃত। তাই ত্রিবেনী সঙ্গম পরম এক পূণ্যস্থান। কুম্ভে, অর্ধকুম্ভে সেথায় পূণ্যস্নানের উৎসব ঘটে। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলাতেও মিলিত হয়েছে পাঠক, লেখক আর প্রকাশক- এর তিনটি ধারা, আর তাতে মিশ্রিত আছে অমৃতসম পুস্তকের বিপুল ভান্ডার। এ কি তবে তীর্থস্থান নয়? পরে জেনেছি পাঁচদিনে এই তীর্থে পূণ্যস্নানার্থীর সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। জঙ্গম এই জনসমুদ্রে আমিও ছোট্ট একটি ঢেউ, ভাবতেই দারুণ এক অনুভূতি! একটি ব্যাপার দেখে খুব ভাল লাগলো- বারো থেকে ষোল বছরের অনেক ছেলে-মেয়ে বিভিন্ন জনপ্রিয় গল্পের জনপ্রিয় চরিত্রের মেকআপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ সেজেছে হ্যারী পোর্টার, কেউবা পিনোকিয়ো, কেউ কেউ আবার পশু-পাখির মুখোশ পড়া। হঠাৎ দেখে মনে হবে 'যেমন খুশী তেমন সাজো'-র প্রতিযোগিতা চলছে। বিকেল ৬টায় সেদিনের মত মেলা শেষ হলো। আমাদের হোটেলটি মেলা থেকে কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ। পুরনো এই দোতলা বাড়ীর একতলায় মালিক থাকেন সপরিবারে, দোতলায় মাত্র চারটি ঘর নিয়ে হোটেল। বাড়ীর চারদিকে গাছপালা, পাখির ডাক শোনা যায়। এ ভবনটি যখন তৈরী হয়েছিল তখন হয়তোবা হিটলারের গোঁফের রেখাটিও স্পষ্ট নয়। মান্ধাত্বার আমলের এই হোটেলের টয়লেটে কমোড ফ্লাস করতে হয় শিকল টেনে। আধুনিক জার্মানে যা কীনা অকল্পনীয়। তবু এত মনোরম ও পরিচ্ছন্ন হোটেলে আমি কখনো থাকিনি। যেন নিজ বাড়ীর শয়নকক্ষটি। হোটেলে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যে কিশোরীটি- সে তিব্বত থেকে আগতা। তিব্বতী হলেও চোস্ত জার্মানী এবং ইংরেজী বলে মেয়েটি। মজার বিষয় সে আবার হিন্দিও জানে। বলিউডের কল্যানে অল্পবিস্তর হিন্দি আমরাও জানি। আমরা তাকে দিদি বলে সম্বোধন করলাম। দেখলাম ছোট্ট এই হোটেলে দিদির একচ্ছত্র আধিপত্য; সে-ই ম্যানেজার, সে-ই ক্লিনার, আর রুমে রুমে চা-কফি-ব্রেকফাষ্ট সরবরাহ করাও তারই দায়িত্ব। বড্ড ক্লান্ত ছিলাম। গেল রাতের বিমান যাত্রা, আর ২৫টি

ফুটবল মাঠ ঘুরে এসে হাত-পা যেন নিথর হয়ে এসেছে। সারা সন্ধ্যে ঘুমিয়ে রাত ১০টায় পাকস্থলীর ছুঁচোগুলোর কেত্তন থামাতে বেরিয়ে পড়লাম। অল্প হাঁটতেই দেখি একটি ভারতীয় রেস্তোরা, নাম 'জুয়েল অফ ইন্ডিয়া'। বাবুর্চির নামটি চমৎকার- পান সিং। খেতে খেতে দেখি পান সিং একা নন; সঙ্গে চুন সিং, সুপুরি সিং, খিলি সিং; অর্থাৎ অনেক পাঞ্জাবী কর্মচারী সেখানে কর্মরত। পাঞ্জাবী রেস্তোরায় যারা খেয়েছেন তারা ভাল করেই জানেন- পাঞ্জাবী খানায় উদোর ও মন দুয়েরই তৃপ্তি। একবার ভাবলাম সিটি সেন্টারে গিয়ে কিছুটা আমোদ করা যাক। একে weekend-এর রাত, তার উপর জার্মান। তবু ক্লান্ত শরীর আমাদের হোটেলেই ফিরিয়ে নিয়ে এলো। দুচোখে নেমে এলো রাজ্যের ঘুম। সকালে ঘুম ভাঙ্গলো দিদির ডাকে, তার হাতে ব্রেকফাষ্টের সুসজ্জিত ট্রে। নাস্তা আর স্নানান্তে আবার ছুটে গেলাম বইমেলায়।

আজ বইমেলার শেষদিন। লোকে লোকারণ্য। সৌভাগ্যক্রমে বেশকিছু বই কেনা গেল, তাও আবার বিরাট মূল্যহ্রাসে। ইতালীয় প্রকাশনী White Star থেকে আমরা বেশকিছু পেইন্টিং-এর বই কিনলাম। ইতালীয় ছেলেগুলো খুবই আন্তরিক ব্যবহার করলো। এমনকি কয়েকটি বই ফ্রি-তেও দিয়ে দিল। জয়তু White Star. আনন্দ প্রকাশনী থেকে বাংলা বই কিনবার খুব আশা। সেলফ-এ শোভা পাচ্ছে সুনীল-সমরেশের সাম্প্রতিকতম বই। তবে প্রকাশনীর কর্ণধার বিকি-তে মোটেও আগ্রহী নন, তাই আমাদের কিনি-র আশায় গুড়েবালি। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রবিন ভাই-এর থেকে বিদায় নিলাম। পুস্তকের এই বিশ্বমেলায় সে-ই একমাত্র বাংলাদেশের প্রতিনিধি।

৮ নম্বর হলে সেইসব দেশের প্রকাশনী স্থান পেয়েছে যাদের ভাষা ইংরেজী। অবাক হয়ে দেখলাম যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আয়ারল্যান্ড-এর সঙ্গে ইসরায়েল থেকে আগত প্রকাশনাগুলোকেও একই হলে স্থান দেয়া হয়েছে। এ কী! হিব্রুভাষী ইসরায়েল এখানে কেন? অবাক হলেও যা বুঝার বুঝে নিলাম- এরা সহদোর। যুদ্ধের ময়দান হোক, বিশ্বরাজনীতির অঙ্গন

হোক আর পবিত্র বইমেলাই হোক- এরা একে অন্যের অভিন্ন প্রান। আরেকটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য- একমাত্র ৮ নম্বর হলে ঢুকতেই দর্শনার্থীদের ব্যাগ তল্লাশী করা হয়। বোঝা গেল বিশ্বজুড়ে এই দেশগুলোর যেমন আধিপত্য, তেমনি এদের ভীতিরও কমতি নেই। ৮ নম্বর হলে ঢুকে একটি ব্যাপার সত্যিই দৃষ্টি আকর্ষণীয়, তা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ভারতের অগ্রযাত্রা। এখানে দেখলাম যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা বেশকিছু প্রকাশনীর মালিকানা ভারতীয়দের হাতে। তাদের সব বই ইংরেজী তবু তারই মাঝে তাদের দেশের ভাল দিকগুলোকে তুলে ধরবার অদম্য চেষ্টা। গান্ধীজি, ইন্দিরা গান্ধী, অমিতাভ, শাহরুখ খান, টেন্ডুলকার-এর জীবনি যেমন আছে, তেমনি আছে অর্থনীতি, দর্শণ এবং পৌরানিক সব বই।

অস্ট্রেলিয় স্টলে দেখলাম বিশালাকৃতির একটি তথ্যমূলক বই, নাম- Earth, ওজন ২০ কে.জি. দাম- ৩০০০ ইয়োরো। এই ৮ নম্বর হলেই দেখতে পেলাম বিখ্যাত প্রকাশনী সংস্থা পেঙ্গুইন, ডি.কে. এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফি-র স্টল। ভাগ্য বটে আমার!

৪ নম্বর হলের দোতলায় ক্যালেন্ডার, পোষ্টার, পোষ্টকার্ড, বুকমার্ক-এর এক বিপুল সমাহার; একতলায় এক পাশে এনটিক বুক ফেয়ার-এর আয়োজন চলছে। একটি বই-এর দাম দেখলাম এক লক্ষ ইয়োরো, বাংলাদেশী মূদ্রায় প্রায় এক কোটি টাকা।

একটি দ্বিতল বিশষ্ট হলে Film & TV Rights Festival-এর আয়োজন চলছে। সেখানে ভারতীয় চলচিত্র শিল্পের প্রতিনিধি হিসেবে বলিউড তারকা শাহরুখ খানের আসবার কথা। নির্দিষ্ট সময়ে হল-এ গিয়ে জানলাম শেষ মুহুর্তে খান সাহেব আসতে পারেননি। অনিবার্য কারণবশতঃ তার জার্মান ও স্পেন সফর বাতিল হয়ে গেছে। তাতে কিছুটা নিরাশ হলেও হতাশ হইনি মোটেও। এ মেলার সবচাইতে বড় তারকাতো বই, আর সে তারকার অভাবতো এখানে নেই। পুস্তককে যদি সত্যিই তারকা জ্ঞান করি, তবে তার

ঔজ্জ্বল্যই কি সর্বাধিক নয়? ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা পুস্তক-তারকায় ছেয়ে যাওয়া এক প্রকান্ড তারকা মন্ডল। কোটি কোটি নক্ষত্রের সমষ্টিগত দীপাবলী এই মেলায়। এ যে শুধু বই-এর মেলা নয়- আলোর মেলা, প্রানের মেলা।

ওদিকে ফ্লাইটের সময় হয়ে এলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি আর অণু মেলা ত্যাগ করলাম। চার হাতে আর দু'কাধে প্রায় ৫২ কে.জি. বই। সকালে চেকআউট করলেও, দিদির হেফাজতে আমাদের বাক্স-প্যাঁটরা গচ্ছিত ছিল। সেগুলো সংগ্রহ করে প্রথমে ট্রামে, তারপর ট্রেনে করে বিমানবন্দরে চলে এলাম। এরপর যথাসময়ের বিমান ধরে হেলসিংকি; সঙ্গে নিয়ে এলাম ৫২ কে.জি. বই, বাক্স-প্যাঁটরা-পোষাক সমেত আরো দশ-বারো কে.জি. দ্রব্যাদি আর অযুত-নিযুত-লক্ষ-কোটি কে.জি.-র অভিজ্ঞতা।

অনেকে বলেছে শুধুমাত্র বইমেলা দেখতে গিয়ে এতগুলো গুচ্ছের টাকা নষ্ট করা নেহাত অপব্যয় আর বোকামি। তাদের তরে বলতে চাই- এ যদি সত্যি তা-ই হয়, তবে সঙ্গতি থাকলে এমন অপব্যয় ও বোকামি আমি ফি বছর করতে ইচ্ছুক। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা আমার সাত বছরের প্রবাস জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জণ।

তক্ষ